পল্লীর পদাবলী

আব্দুল জব্বার

গ্রন্থতীর্থ
৬৫/৩এ, কলেজস্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

নান্দীপাঠ

'পল্লীর পদাবলী' গ্রাম-জীবনের নির্ভেজাল চারণচিত্র।

জেলে, মালি, মুচি, কলু, খাদাল, চটকল-মজুর, চাষী, ঘেষেড়ে, গাড়োয়ান, জোলা, কুমোর, কাঠুরে, বারুজীবি, ঘরামী, দর্জি, মহাজন, মোড়ল, সিউলি সাপুড়ে, ব্যবসাদার, কামার , গোয়ালা— হাজারজনের হাজার রকম বৃত্তির কথা আমি লিখেছি। এইসব মানুষদের মধ্যেই আমি জন্মেছি, বড় হয়েছি, একই জল-হাওয়া, একই রক্ত-নাড়ীর সম্পর্কের মধ্যে। যেসব তথ্য এতে আছে তা কোনো সংগ্রহ করা ব্যাপার নয় আদৌ, আপনা-আপনিই এসে গেছে সহজভাবে সাধারণ মানুষদের কথা বলতে গিয়ে।

তথ্যপূর্ণ ফিচার হলেও লেখাগুলি নীরস নয়, বরং রম্য-রচনা, আর সমসাময়িকতা থাকলে শুধু খণ্ডিত একটা সময়কেও ধরে নেই। প্রচুর উপাদান আর বিচিত্রভাবে বেঁচে থাকার ঐতিহাসিক দলিলও এটি। Robert Lynd বলেছেন, 'Literature is journalisam that lasts.' (যে সাংবাদিকতা টিকে যায় তার নাম সাহিত্য)। টিকে থাকার মতো সম্পদ এবং গ্রাম-বাংলায় নানা ধরনের বিচিত্র সব শব্দ এতে আছে বলে সাহিত্যপদবাচ্য হবে আশা রাখি।

১৯৭০ থেকে ৭২ সালের মধ্যে প্রতি সপ্তায় এই গ্রন্থের প্রায় সমস্ত লেখাই দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় সহ-সম্পাদকীয় কলমে প্রকাশিত হয়েছিল। অনেকগুলি লেখায় অশোক ফেরদৌসি ছদ্মনাম ব্যবহার করেছিলাম, পরে তা ত্যাগ করি, আসলে নামটি আমার পুত্রে। রচনাগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশের অনুমতি দান করার জন্য যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক মহোদয়কে অশেষ ধন্যবাদ।

এই গ্রামীণ তথ্যভরা লেখাগুলি যাতে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় সেজন্য শ্রদ্ধেয় আচর্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বার বার বলেছিলেন। তাঁর সেই আশা পূর্ণ করলেন মহৎ সাহিত্য-সংস্থা রবীন্দ্র লাইব্রেরী, এর জন্য আমি কৃতজ্ঞ। বইটির প্রসাদগুণের সঙ্গে মিলিয়ে নিপুণ চিত্রকলার বৈশিষ্ট্যে প্রখ্যাত শিল্পী আশা বন্দোপাধ্যায় মনোরম প্রচ্ছদপট এঁকে এবং সুহৃদ্বর শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার যত্ন করে প্রুফ দেখে সাহায্য করার জন্য দুজনকেই আমার আন্তরিক প্রীতি ও ভালবাসা জানালাম।

'বাংলার চালচিত্র', 'মুখের মেলা', 'জনপদজীবন' এবং 'পল্লীর পদাবলী'—এই চারিটি গ্রন্থ আসলে গ্রাম-জীবনের একটি সত্যতথ্যচিত্র অথবা সমীক্ষা সংহিতা, যদিও 'মুখের মেলা'র সঙ্গে জনপদজীবনের'র এবং 'বাংলার চালচিত্রের'র সঙ্গে 'পল্লীর পদাবলী'র সম্পর্ক নিবিড়তর।

যত্ন নেওয়া সত্ত্বেও যদি কিছু ত্রুটি চোখে পড়ে নিজগুণে ক্ষমা করবেন।

ইতি—

আবদুল জববার

গ্রাম ঃ সাতগাছিয়া, ডাকঘর ঃ নোদাখালী
দক্ষিণ ঃ ২৪ পরগনা

যাদের নিয়ে এই পদাবলী

যে গাঁয়ে আছি/৯; গাঁয়ের মানুষ ঃ গাঁয়ের মোড়ল/১২
আল্লা ম্যাঘ দে পানি দে/১৫
যন্ত্র-দানবের শিকার এবং বড় বাবুর দয়া/১৮
এ ঘোর রজনী মেঘ গরজনী দাদুরী ডাকিছে সঘনে/২৯
আবার নিরন্ন দিন শুরু হল/২৪
চাষ ঃ চাষীর ছেলে ঃ লেখক/২৭
গাঁয়ে রথের মেলা; /২৯ গাঁয়ে ট্রাক্টর এল/৩২
এমন ভয়ঙ্কর বর্ষা আর দেখিনি;/৩২ বন্যার পর নিদারুণ দুর্দশা/৩৮
বানে ভাসা গ্রাম, তবু আনন্দময়ী আসছেন/৪১
ঈশ্বর ঃ প্রকৃতি প্রেম ঃ শারদ-উৎসব/৪৪
সবে-বরাত ঃ সৌভাগ্য রজনী/৪৭
মা মনসার দয়া ঃ কেউটে বোড়ার ছোবল/৫০
শহরের দৌলতে গ্রামের কিছুই এখন ফেলা যায় না/৫৪
তোরা চটকলের মজদুর হ'গে যা ঃ /৫৭
দরবেশ মিয়ার বঙ্গদর্শন /৬০; মগের মুলুক ঠগের মুলুক ঃ ৬৩
গাঁয়ের মানুষের লৌকিক-সংস্কার/৬৬
চাষী ছমিরদ্দি চাচার কেচ্ছা/৬৯
গাঁয়ের হাট ও তার মানুষজন/৭২
কানাই গুরুমশাই/৭৬; মৎস্য-সংহিতা/৭৯; শহরতলীর পণ্য/৮২
কার্তিক মাস ঃ ফসল বোনার দিন/৮৬
ধানের আশা কার্তিকের ঝড়ে উড়ে গেল/৮৯
কামারশালায় যাই এসো/৯২; গাঁয়ের পথঘাট/৯৬
চটকল শ্রমিকদের নসীব/৯৯; গাঁয়ের লোকের মামলার নেশা/১০২
ওরা কাজ করে/১০৬; লালবানু বিবির কথা/১০৯
ঝ্যাৎলা-চাটাই-শোলা-পাখা/১১২
নারকোল একটি মহার্ঘ্য ফসল/১১৪
পৌষ মাস ঃ পিঠে পার্বণ ঃ লক্ষ্মীমাস/১১৮
চামড়া ছাড়ানো খাদাল/১২১
পেখেরা এবং পাখি-ধরা পেশা/১২৪
গাঁয়ের মোড়ল এবং ধানের দাম/১২৮
বাঁশের বারোমাস্যা/১৩১; চোখের জলের জীবন/১৩৩

নোনা মাটি থেকে নুন তৈরি করে যারা/১৩৬
চাষীর সংসারে গাই-বলদের ভাবনা/১৩৯
তালের রস/১৪২; সৃষ্টির সুধা এবং গরল/১৪৪
'আল্লার কিরে চাচা মুই হেঁদু'/১৪৬
বাঙালীর নতুন মর্যাদা জয় বাঙলা/১৫০
গোষ্ঠমেলায় লোক-জীবনের ছবি/১৫২
গরীবরা চিরদিনই গড়াগড়ি যায়/১৫৫
শত বছরের পরমায়ু চান তো বাংলায় জন্মাবেন না/১৫৮
সার মাটি এবং ফসলের সমস্যা/১৬০
সুধার সব উৎসই ক্রমে শুকিয়ে যাচ্ছে/১৬৩
কাঠের কাজে রোজগার কিছু কম নয়/১৬৫
শ্রীযুক্ত গণেশের বউ/১৬৭
গ্রামে শহরের ছোঁয়া লেগে লাভ কী হচ্ছে?/১৭১
পশ্চিমবঙ্গের নামযজ্ঞ/১৭৩; সূয এখন রাবণের চিতা/১৭৫
সবুজ যৌবনে আগুন/১৭৮
গোসাবা থানার পথঘাট এবং দুঃসহ দারিদ্র্য/১৮০
জন্মশাসন ও মুসলমান সম্প্রদায়/১৮৩
যেসব শব্দ অপাংক্তেয়, যেগুলি হারিয়ে যাচ্ছে/১৮৬
গ্রাম-বাংলায় জীবনের শিকার/১৮৮
ক্ষুধার্ত গ্রাম-বাংলা/১৯০

যে গাঁয়ে আছি

পঁচিশ-তিরিশ বছর আগে যখন একশো টাকা হলে এককুঠরি টিনের ঘর হয়ে যেত, একটা পুকুর কাটানো যেত পাঁচশো টাকা খরচা করলে, একবিঘে জমি কেনা যেত মাত্তর একশো টাকাতে, ধানের দাম ছিল দু'টাকা বস্তা, পাঁচসের খাঁটি দুধ আর ষোলটা ইলিশ টাকায়—তখনকার দাদুরা নাকি মুচির বাড়ি থেকে আটআনায় একজোড়া কাঁচা চামড়ার চটি জুতো কিনে এনে সারা জীবনটা তাতেই পার করে দিতেন। কোনো আত্মীয় 'ঘাটে ওঠবার' সময় অর্থাৎ বাপ-মায়ের শ্রাদ্ধে কিংবা পুত্রকন্যার মাথায় একঘটি জল ঢেলে 'আইবুড়ো' নাম ঘোচাবার বেলা নেমন্তন্ন করলে শুকিয়ে আম্‌সি হয়ে-যাওয়া চটি জোড়াকে ঘরের চালের 'বাতা' বা ছাউনির তলা থেকে পেড়ে নিয়ে পটাস পটাস করে পিটে ধুলো-ঘুণ-মাকড়সার জাল ঝেড়ে ফেলে দিয়ে খিড়কীর দিকের গুঁড়িপানা ভরা এঁদো ডোবা থেকে ডুবিয়ে ভিজিয়ে এনে গামছা দিয়ে মুছে হালবাড়ি-চষা পায়ের গাবদা গাবদা মোটা আঙুল ক'টা কোনক্রমে একটু ঢোকে কিনা দেখে নিয়ে বগলদাবায় করে চলে যেতেন একহাঁটু ধুলো ভেঙে, মাঠ-ঘাট পেরিয়ে। 'কাজ-বাড়ি'র কাছাকাছি যেয়ে চটিজোড়া আধাপায়ে ঢুকিয়ে নেংচে নেংচে চলে গেলেই কর্তামশায় গাড়ুগামছা বা বদ্‌না-লোটা নিয়ে চরণসেবা করতে ছুটে আসতেন। খড়ের বা উলুর সে ছাউনিও আর নেই, চটিও গেছে, হুমড়ি-খাওয়া-ভুঁয়ে-মুখ রগড়ানো ভুঁইকুঁড়েও বিদায় নিয়েছে, তিনমাথা বুড়োদের কথা আর চলে না, কলসীর মধ্যে দ্রোণ জন্মের মহাভারতীয় আজগুবি গল্পের দিন নাকি ফুরিয়ে গেছে; কিন্তু বুড়োরা বলেন, 'তোমাদের টেস্ট টিউবে বাচ্চা তৈরি করাটার মতলব পেলে কোথা থেকে? মুনিঋষিরা গ্রহগ্রহান্তরে চলে যেতেন যোগবলে—একালের সভ্যতা তো শিশু হে তাঁদের কাছে।...আমরা যা খেয়েছি তোমরা চোখে দেখেছ?' এই শেষ কথাটায় তরুণরা জব্দ। গ্রামের মোড়ে মোড়ে চা দোকান, যা দুধ হয় তিনগুণ জল মিশিয়ে চা-দোকানে বেচে দেয় গোয়ালারা— একটু খাঁটি দুধ-ঘি পাবে না— যতই টাকা দাও। দিলেও বিশ্বাস করা যায় না। হাঁড়ি করে মধু ভেঙে আনছে মউলেরা, জ্যান্ত মৌমাছি নড়ছে, তবু লোকজন বলে, 'সরষের তেলের দরে দিলে কি হবে, ওতে মিছরি জল কিংবা বড়বাজার-থেকে আনা একরকম কেমিকেল ওষুধ আছে, ধরতে পারবে না'— ঠিক মধুর মতন, মধুঅলা আল্লার নামে সাত মসজিদের 'কিরে' (শপথ) খেলেও বিশ্বাস করে খুশিমনে ঐ মধু সদ্যজাত সন্তানের গালে দিতে পারবেন না। বৃদ্ধরা হাসেন। হাসেন একেবারে যেন সেই অন্ধকার অতীতের মুসাযুদ্ধের আমলের হাড়ের কঙ্কাল নাড়া দিয়ে! তাঁরা নৈবেদ্য—আধুনিককালের সভ্যতার নকল নাড়ুটা কাঁপতে থাকে তাঁদের তাচ্ছিল্যের হাসিতে।

বছর বিশ-পঁচিশেই খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে গ্রাম। ঢেঁকি গেছে, হুঁকো গেছে, উলুখড়ের ছাউনি গেছে, চটি জুতো, আগুন মালসা, সরষে-নারকোল ভাঙানো ঘানি, পান্তাভাত, খড়ম, রাজা, জমিদার, উড়ানি, গাড়ু, লোটা চলে গেল—চলে যাওয়ার জোয়ারের টান লেগেছে বাঁশের

আগড়ের দোর, ছ্যাঁড়া, ছিটেবেড়া, ঝ্যাঁৎলা-মাদুর, খেজুরচাটাই, তালপাতার পাখা, কবাটি খেলা, ধাসি খেলা, কাঁথা, গরুর গাড়ি, গোড়ার গাড়ি, পাল্কী, কোবরেজ, গোবদ্যি, টিকি-দাড়ি পৈতে, মাটির ঘর, জোতদারী-বর্গাদারী, ধর্মীয় আচার-আচরণ-উপদেশ, পুরুতগিরি, মোল্লাকী, হোমিওপ্যাথি, ভূতপ্রেত, খ্যাঁচ-দানো, মন্তর, বাণ-মারা, যাদুটোনা, দোয়াতাবিজ, বরকত, বিশ্বাসে—ঈশান কোণের আকাশ থেকে লাল মেঘের ঝড় উঠেছে। ধুলো উড়ছে—যুগান্তের কালান্তর ঝড়—সে ঝড়ের হাওয়া লেগেছে গ্রামের গাছপালায়, জীবনে।

তিনমাথা বুড়োরা তবু রেডিও শুনতে শুনতে এখনো পাতিঘাস কেটে এনে ঝ্যাঁৎলা বুনছেন, ছড়িসুতো টাকুরে পাকিয়ে নিয়ে খেপলা-জাল, ছাকনি-জাল বুনছেন, ঢ্যারা ঘুরিয়ে পাট কেটে মালাকলে পাকিয়ে গরুর দড়ি ভাঙছেন, বুড়িরা নারকোলপাতা পুড়িয়ে গুল তৈরি করে তাতে মতিহার দোক্তা মিশিয়ে মিশি মুখে দিয়ে নথ নেড়ে খেসারি কলাইয়ের জাঁতা ঘুরোচ্ছেন পা ফেরকে বসে, ধান-চাল পাছড়াচ্ছেন কুলো ধরে, 'বেওন' (বীজ) ধান বাছছেন লম্ফ জ্বালিয়ে সাঁজের অন্ধকারে, গরুর খড় কুঁচোচ্ছে বউরা, ছেলেমেয়েরা মাস্টারের কাছে 'পেরাইপিট' পড়ছে দলিজে বসে। বৈশাখের গোষ্ঠর মেলায় চাষীর বাড়ির ছেলেরা চশমা, টেরিলিন, টেরিকটন পরে টুইস্ট নাচ দেখিয়ে মেয়েদের লজ্জায় লাল করে দিয়েছে! গাড়োয়ান, জোলা গোয়ালা, রজক, মুচি, ডোম, বাগ্‌দি, মোল্লা, হাজী, গরীবলোক, বড়লোক—সবায়ের বাড়ি থেকে এখন রেডিওর 'বিবিধ ভারতী' শোনা যায়—'নাগিনওয়ালা আগেয়া'—'ঝুমকা গিরারে..!' অবশ্য গোঁড়া মৌলভীরা এখনো 'রেডিও যন্তরটা হারাম' বলে বেড়াচ্ছেন, যদিও তাঁরা মিলাদ-মহফিলে মাইকে দরাজ গলায় 'ওয়াজ-নসিহত' করেন। তাঁরা জানেন না যে, মক্কাতেও রেডিও সেণ্টার আছে!

কলেজে-পড়া ছেলেরা অথবা বি-এ, এম-এ পাশ করে মাস্টারী-করা তরুণরা চা-দোকানের মোড়ে ব্রিজ খেলে, রাজনীতি, সিনেমা বা সাহিত্যের গল্প করে। বৃদ্ধরা মিটিমিটি তাকান। অনেকে বোঝেন, অনেকে বোঝেন না তরুণদের গল্প। দিলীপকুমার, দেবানন্দ, সুচিত্রা-সায়রা বানু, জ্যোতিবাবু, অ্যাপালো-১৩কে গোপন হিটস্ট্রোক, শেষে লণ্ডভণ্ড কীর্তির কল্কি-অবতার নকশালদের বাছাই বাছাই কথাবার্তা। তবু এর মধ্যে যে ছেলেটি এম-এ, বাপ যার বহু কষ্টে বিষয়-সম্পত্তি, দুটি সংসার রেখে বহু জটিল রোগ-যন্ত্রণায় পচে গলে মারা গেলেন, সাত-আটটি ভাই-বোনের স্কুল-কলেজ ইউনিভারসিটি পড়াশোনার ভার কাঁধে নিয়েছে, পুকুর কাটাচ্ছে। যে ছেলেটি লাভম্যারেজ করেছে নিজে মুসলমান কমিউনিস্ট হয়ে ব্রাহ্মণ মেয়ের সঙ্গে, সেও রুমালে করে আধকেজি ঝিঙে, চাট্টি পটল, টাটকা মৌরালা মাছ আর দুটো আপেল কিনে নিয়ে যাচ্ছে।

ঢেঁকি গেছে, হাস্‌কিং মেশিন এসেছে, কাঁথা গেছে, কম্বল এসেছে, তরজা ভাইয়ের কবিগান গেছে, রেডিও সিনেমা এসেছে, ঝ্যাঁৎলা-মাদুরী গেছে, লিনোলিয়াম এসেছে, ধুতি-লুঙ্গি গেছে—এসেছে প্যাণ্ট-পাজামা।

ইলেকট্রিক এসে পড়েছে কিছু হাটবাজারঅলা পাকাবাড়ি দোকান যেখানে বেশি সেসব জায়গায়। বাস চলেছে কলকাতার দিকে। পানের মোট লরী-ভর্তি হয়ে যাচ্ছে শেয়ালদা। বারাসাত অঞ্চল থেকে 'ম্যাসতা' পাটের প্যাকাটি আসছে লরী ভর্তি হয়ে। টালিখোলা, ধান, খড়, কয়লা, কাঠ চলেছে লরীকে লরী।

খবরের কাগজ, সাপ্তাহিক পত্রিকা আসছে সকাল আটটার মধ্যেই।

গ্রাম আর গ্রাম নেই যেন। মাটি কাটা হচ্ছে, ধান রোয়া হচ্ছে একটা রেডিওসেট্ বাঁশ পুঁতে ঝুলিয়ে বেঁধে রেখে দিয়ে। রবীন্দ্রসঙ্গীত হচ্ছে ঃ 'আলো আমার আলো, ওগো, আলো ভুবন ভরা...'

কিন্তু তবু অন্ধকার। লম্ফ, হ্যারিকেন, হ্যাসাকের আলোর তলায় মানুষের চেহারাগুলো বড় মলিন, রোগজর্জর, ময়লা কাপড়চোপড়, কথাবার্তার মধ্যে অশালীন ক্ষোভ, ক্রোধ, কন্ট্রোলে পচা চাল-গমের জন্যে লাইন, বরফের পচা মাছ তাও চারটাকা কেজি, লঙ্কা আটটাকা, চাল একটাকা পঁচাত্তর পয়সা, কাপড়, ওষুধ, মারামারি, মামলা, রাজনীতি—কাবুলীর দেনা, চাকরি নেই, জমিতে নোনা ফুটছে, সার কেনার টাকা নেই। সোমত্ত মেয়ে নাই বার করে কাপড় পরতে ধরেছে...অনেক সমস্যা।

তারপর ছোঁড়ারা আবার বলছে, বিপ্লব আসন্ন। আহা, বেচারীরা তুব একপলা দুধ পাচ্ছে না! বাবা পঁচাত্তর টাকা যোগাড় করে ধাপার এক লরী ময়লা-সার আনতে পারছে না বলে ভেবে আকুল, অথচ লুকিয়ে দু'বস্তা খোরাকীর ধান বেচে সাপের খোলসের মতন জামা কিনে এনে বেটা গোষ্ঠর মেলায় মেয়েদের লজ্জায় লাল করছে টুইস্ট নেচে।

গরীবের বউরা কেউ কেউ চোরাই চাল নিয়ে যায় কলকাতা শহরে প্রতিদিন একটু সাজগোজ করে। ফেরার পথে খিদিরপুর ডক থেকে চোরাই গম এনে গাঁয়ের হাটে বিক্রি করে। চেক-পোস্টে ধরা পড়ল দু'একরাত পুলিসের হেপাজতে থেকে যায়। তাদের মধ্যে যাদের যৌবন দেখে এখনো মানুষ আকৃষ্ট হয়, তারা বিনা পুঁজিতেই ব্যবসা চালাতে যায় শহরে, স্বামীর কাছে ছেলেমেয়েদের গচ্ছিত রেখে। বাপ তার টাকায় আপেল খায়, স্বামী খায় খাসীর মাংস!

নাগরিকতার যা কিছু ব্যাধি উপসর্গ হয়ে, নকল হয়ে সুখ-হারানো সংসারের মধ্যে উলঙ্গ সওদাগর সাজে নেমে এসেছে ঃ লে লো বাবু ছে আনা।

মাইক নাহলে বিয়ে হয় না।

ব্যান্ডপার্টিও আসছে।

তাইচুং হচ্ছে।

রেডিও খবরের কাগজ পার্টির ইস্তেহার সবই হুড়হুড় করে আসছে গ্রামে।

ঠাকুরদাদার চটিজোড়া শুধু তাঁর সঙ্গে স্বর্গে চলে গেছে, তাঁর প্রতীক 'বেরসো' কাঠও দেওয়া হয়েছিল, ষাঁড় দাগিয়ে ছাড়াও হয়েছিল তাঁর নামে, কিন্তু বাবাকে কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, খালিগায়ে পৈতে বার করে টিকি নেড়ে যেন তিনি শহর থেকে-আসা বন্ধু-বান্ধবীদের সামনে না যান—হুঁকোটা যেন দয়া করে না টানেন, ঝ্যাঁৎলা বা জাল না বোনেন, ইস্ত্রি-করা ধুতি-সার্ট পরে যেন সবিনয়ে করজোড়ে নমস্কার করেন। আর বেশি কথা যেন আদৌ না বলেন। কেননা তিনি মূর্খ। 'আপনারা এসো বাবা'—বললেই আক্কেল গুড়ুম।

গাঁয়ের মানুষ ঃ গাঁয়ের মোড়ল

বাপের 'ছান্দ' হলেও 'কু-বারে' অর্থাৎ লক্ষ্মীবার কিংবা রবিবার বাদে, গাঁয়ে কোথাও মাছ-মাংস পাওয়া যাবে না! কুটুম এসে পড়লে, শ্বশুর কিংবা বড়লোক কেউ, জাল ফেলে পুকুর থেকে পোনামাছ ধরতে হবে, মোরগ জবাই করতে হবে। গাঁয়ের দোকানগুলোতে যাও, বারো আনার আলু একটাকা, সাতকে সতের দাম। তাই হাটবারে চাষী, গরিব ক্ষেতমজুর, শ্রমিক সবাই টাকা যোগাড় রাখে মাছ-আনাজ-চাল—কাপড়-ঝ্যাঁৎলা-মাদুর—কাটারী, কোদাল-কড়া—ঝাল-তেল-নুন ইত্যাদি কিনবার জন্যে। যার টাকা যোগাড় হল না তার বউ-ছেলেমেয়েরা খেতে পাবে না, মুদি দোকানে থালা বন্ধক, বাস্তুভিটে বন্ধক দিয়ে যবের আটা, বেসম, ছাতু কিনে এনে অর্ধাহারে অনাহারে কাটাতে হবে!

শতকরা ৯০ ভাগ গাঁয়ের লোক হাটে বাজার করতে যার লক্ষ্মীবারে। ৫ ভাগ আদৌ যায় না। তাদের ক্ষেত-খামার, ব্যবসা-বাণিজ্য আছে। ক্ষেতে তরি-তরকারী হয়। তাদের মাল-জাল হাটে বিক্রি করতে যায় তাদেরই লোকরা। চাল, কলা, মুলো, বেগুন, নারকোল, শশা, গুড়, লঙ্কা, হলুদ, পটল, আলু, শস্যবীজ ইত্যাদি সবকিছু।

সব চাষীর সব নেই, সবায়ের মিলে হাট। বাদাঅঞ্চলের মেয়েপুরুষরা আনে পাতিঘাস থেকে বোনা ঝ্যাঁৎলা এবং মাদুরী, খেজুর পাতার চাটাই, ডিম, হাঁস, মুরগী, পাট। এসব বেচে চাল-ডাল, তেল-নুন, পচা চিংড়ি, শুঁটকীমাছ, সমুদ্রের কাঁকড়া কিংবা কচ্ছপের মাংস কিনে নিয়ে যায় হাট শেষে। বাড়ি থেকে কিছু নিয়ে গিয়ে কিনে আনা লোকের সংখ্যা শতকরা ২৫। এককাঁদি মর্তমান কলা নিয়ে হাটে যাও, ৫ টাকা পণ (৮০টা), ছড়ায় ১৪টা করে কলা থাকলে ৮ ছড়ায় ১১২টা—তাহলে দাম হবে ১১২ আনা—অর্থাৎ ৭টাকা। এই কলা পাকলে কলকাতার লোক কিনে খায় নাকি এক-একটা চার আনা দিয়ে! তাদের অনেক পয়সা—অনেক বড় বড় চাকরি! সোনার দেশ কলকাতা!

কলকাতায় চার আনায় একটা কলা, এক আনায় যা বিক্রি হল, গাঁয়ের গরিব চাষার ছেলেমেয়েদের বঞ্চিত করেই বাকি তিনআনা ব্যবসায়ীর লাভ্ যে বেচবে এবং যে কিনে আবার বিক্রি করবে—দু'জনের মধ্যে।

কলকাতার মানুষের সঙ্গে গাঁয়ের মানুষের মূল্যমানেরও এমনি আসমান-জমিন ফারাক।

গ্রাম অন্ধকারে ধুঁকছে। কিন্তু শতকরা যারা ৫ জন, শুধু কেনে না, বেচে, বাক্সে টাকা তোলে, ব্যবসা বাড়ায়, তারা এখন রাজা। তাদের পাকাবাড়ি হয়েছে, বাড়িতে বন্দুক এসেছে—ব্যাটার বিয়েতে ১০টা খাসী জবাই হয়, ইংরিজি বাজনা বাজে। দুটো মুদিখানায় প্রতিদিন দু'তিন হাজার টাকার বিক্রি হয়। ধান ভানানী কল চলে। ট্যাক্সি, লরী, গরুর গাড়ি, নৌকো চলে। কারো দশ কাঠা জমি বন্ধক বা বিক্রি হবে, গাঁয়ের মোড়লকে না জানিয়ে অন্য কাউকে দিলে মোড়ল চিৎকার করে মোড়ের মাঝখানের চা-দোকানে মা-মাসি তুলে গালাগাল করবে।

এই মোড়লরা যখন বাইরে বের হয়, হ্যান্ডলুম বা খদ্দর পরে। জোড়হাতে বিনয়ের সঙ্গে

নমস্কার-বিনিময় করে। বাসে উঠে আলিপুরে আর এক মোড়লের বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা করতে কিংবা কয়লা, টিন, সিমেন্ট ইত্যাদির লাইসেন্স পারমিট বার করে মাল এনে ব্ল্যাকে দু'পয়সা কামাই করবার জন্যে তাদের মাঝে মাঝেই যেতে হয়।

এক মোড়লের কলঙ্কিত ইতিহাস ছেলে-বুড়ো সবাই জানে, লম্বা লোক, লম্বা খদ্দরের পাঞ্জাবি, কোটরে ঢোকা কটা চোখ, মাথার কাঁচা-পাকা চুল ঝেঁপে আছে কপালে, হাতে অ্যাটাচি ব্যাগ, পরনে মোটা চাদর, পায়ে বুট—চলে ডিং মেরে মেরে—বেনামী তিনশো বিঘে সম্পত্তি, চৌদ্দটা ছেলেমেয়ে, বড়টি থাকে কাপড় দোকানে, সেখানে আছে টেলিফোন, মেজো ছেলে মুদিখানায়, সেজো এম-এ, বি-টি, হাই স্কুলের মাস্টার, ন-সেজো বিলেতে ডাক্তারী পড়ছে, তপশিলী সম্প্রদায়ভুক্ত হলেও তার বউ বামুনের মেয়ে, সেও গেছে বিলেতে—অসবর্ণ বিয়ে হয়েছে, বাপ নীরব, সেজো ছেলে এম-এ পাশ হলেও আদর্শবাদী বামপন্থীমনা বলে গরিব একটি গ্র্যাজুয়েট মেয়েকে বিয়ে করেছে—বাকি ছেলেরা স্কুল কলেজে পড়ছে—অনেক মেয়ে বিদায় হয়েছে—মাসে কত খরচ? হরিপদ জানা গাঁয়ের মোড়লের কন্ট্রোল, লরী, ধানকল, ইটখোলা কত কি যে আছে তার হদিস নেই। মাসে তার উপায় নাকি চার হাজার টাকা।

কেউ তিন হাজারী মোড়ল, কেউ দু'হাজারী, কেউ পাঁচশো টাকার, কেউ বা তিনশো টাকার।

মোড়লে মোড়লে যোগ, আত্মীয়তা, মামলা। কাটাকাটি। গরিব জন-মজুররা তাদের সাঙ্গপাঙ্গ। তারাই ঘাম-রক্ত ঝরায়। মামলার সাক্ষ্য দেয়। জেল খাটে।

এমন দিনে হঠাৎ মোড়ের মাথার লম্বা বাঁশের মাথায় উঠল লাল পতাকা। কাস্তে-হাতুড়ি চিহ্ন আঁকা। তার তলায় জুটেছে গরিবরা। জোতদার বড়লোকরা গালাগাল করে। যাদের গালগাল করে তাদেরই ঘরে আবার ধান তুলে দিয়ে আসে অন্ধকারে। কেউ গতর খেটে দাম আদায় করে, কেউ করে না।

জোতদার গাঁয়ের মোড়লরা অঞ্চল-পঞ্চায়েত ভোটে হেরেছে লজ্জাকরভাবে—গাঁয়ের দরিদ্ররা আর তাদের মোড়লী চায় না। তাই মোড়লরা টাকা-ব্যবসা থাকলেও এখন আর বেশি 'বড়ফট্টাই' করতে পারে না।

মুচি, তিয়োর, ডোম, ক্যাওড়া, মুসলমান, বামুন, কায়েত, মাহিষ্য সবাই একাকার। চাড়ালের ছেলে হয়ে গেল অঞ্চলপ্রধান। কন্ট্রোলে বস্তার দাম বলে কেজিতে দু'পয়সা বেশি নিলে অমনি পার্টির ছোকরারা দরখাস্ত ঠোকে টু দি সাবডিভিসনাল অফিসার ফুড অ্যান্ড সাপ্লাই— আলিপুর, উইথ এ স্ট্রং রেকমেন্ডেশন ফ্রম এম-এল-এ, অমুক চন্দ্র তমুক!

তেমনি মোড়লরাও নিষ্ঠুর হতে জানে।

কারখানার লক-আউট ভাঙতে গিয়ে কোম্পানীর পক্ষের গুণ্ডার লাঠি খেয়ে সাবাড়-হয়ে-যাওয়া শের আলীর তিনছেলের মা-জোয়ান-বৌটা ধানকল থেকে 'বানী'র দেড়মণ ধান ভানিয়ে নিয়ে অন্ধকারে বাড়ি ফেরার সময় হঠাৎ তার পায়ে কি যেন কামড়াল। তীব্র জ্বালা! ব্রহ্মতালু জ্বলে উঠল একেবারে। কোনোক্রমে বাড়িতে এসে শুয়ে পড়ল মেয়েটি। পায়ে রক্ত ঝরছে। বুড়ি মা শুনল, সাপে কেটেছে। ব্যাপারটা নাকি গোপন রাখবার কথা। নইলে যে মন্ত্র জানে সে 'ভারবে'। প্রাণটা বার করে নিয়ে গিয়ে শালুক পাতায় ভাসিয়ে রাখবে। হাজার ঝাড়-ফুক করো—আর বাঁচানো যাবে না।...তবু ঘটনাটি পাড়া থেকে পাড়ায় রটনা হয়ে যায় পরদিন সকাল পর্যন্ত। তখন একজন পাড়ার লোক বলে, 'অমুকদের বাড়ির পাশে সরু রাস্তাটায় আমি গতকাল সন্ধ্যার পর ফেরার সময় টর্চ মেরে মেরে আসার সময় একজোড়া চন্দ্রবোড়াকে শুয়ে থাকতে দেখেছিলাম। আলো লাগতেই সনসন করে পালিয়ে গেল! তাহলে সেই সাপই কামড়েছে।'